ঐতিহ্য
The Heritage

© Aitihya Samstha

Vol.I 2011
pp.59-69

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ একটি নিম্নবর্গের আখ্যান

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
বাংলা বিভাগ, প্রাগজ্যোতিষ কলেজ, গুয়াহাটি-৭৮১০০৯, অসম।

CHATURTHA PANIPATHER YUDDHA : A SUBALTERN NARRATION

ABSTRACT : *Subodh Ghosh is well-known to the Bengali readers for numbers of his different popular short stories. The elite society of Kolkata discovered him in the 40's. 'Ajantrik' was his first work in this field. 'Fossil', the second of his entire creation was a story of the oppressed in India. Actually his struggle in life helped him to gather experiences regarding different folk-lives of India. In the late 40's he wrote a book on Indian 'adivasis'. Though he was not an anthropologist, he handled the subject in a scientific manner. There in a chapter he wrote a real story of Birsait, a young person whom we find as Stephan Horo in the story titled 'Chaturtha Panipather Yuddha'. After his (Subodh Ghosh's) birth centenary certain academic discussions have taken place in different essays and Ph.D works, but lots are still to be done. Therefore, we have taken this story for re-reading. As this one depicts the life of oppressed of our society, we think it will be wise to analyse the story under the light of subaltern studies. Earlier, this study as a postmodern theory of literary criticism tried to find out the real nature of the subalterns. But in the late 80's Gayatri Chakravorty Spivak thought it right to find out the process of making the subalterns in a hegemonic discourse. Ranjit Guha, Gautam Bhadra and many others also support this line of thinking. Accordingly, we have tried to find out the same in present context. From the narration of Subodh Ghosh we can identify Horo, Tudu, Chirki, Old Sokha as the subaltern. They are the 'other' from the point of view of Father Lindon, Panditji — the Sanskrit teacher in the missionary school and Ghosh — the interclass Bengali intellectual. We also find that amateur anthropologist Subodh Ghosh with his experienced references made it possible for the story to be a subaltern narration. The citations in the story clearly show the making of subalterns by the upper class.*

Scanned with OKEN Scanner

২ জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

বাংলা ছোটগল্পের আলোচনায় সুবোধ ঘোষ একটি পরিচিত নাম। চল্লিশের দশকে তাঁর আবির্ভাব। এই আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি চমকপ্রদ। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি যুগের সৃষ্টি-নিরীক্ষায় মরশুমি অজস্রতার অবসানের পর যেমন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', তারাশঙ্করের 'জলসাঘর', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' নবযুগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' গল্প দুটি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নবপ্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। অযান্ত্রিকের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর গল্পটি তাঁর প্রথম রচনা।[১] তবে সেখানেই থেমে থাকা নয়, সুবোধ ঘোষ এরপর এগিয়ে গেছেন অনেকদূর। হাজারিবাগের ছোটবেলা থেকে কলকাতার বড়বেলা পর্যন্ত যাপিত জীবনে অভিজ্ঞতার যে নুড়িগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকেই পাথেয় করে একের পর এক সফল বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। যে- ভারতবর্ষকে সুবোধ ঘোষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, গল্পের আনাচে-কানাচে সেই ভারতবর্ষ তাঁর দ্রষ্টাচক্ষুর আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষকে কেন্দ্র করে নির্মাণবায়নের অসাধারণ সব ছবি তাঁর কলমে ধরা পড়েছে। বার বার বিভিন্ন গল্পে নির্মিত হয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস। অথচ বহুদিন এই কৃতবিদ্য লেখকের বিষয়ানুগত সৃষ্টিগুলো হয় প্রথানুগত আলোচনার ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ে ছিল, নয়তো সমালোচকের অবহেলার শিকার হয়েছিল। লেখকের জন্মশতবর্ষ নতুন করে উৎসাহ জাগাল। প্রয়োজন দেখা দিল পুনঃপাঠের। এই প্রেক্ষিত থেকেই আমাদের আজকের আলোচনা।

ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনার আখ্যান নির্মাণে সুবোধ ঘোষ একনিষ্ঠ আর 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' তার উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন। শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে আজকের সাধন চট্টোপাধ্যায় বা রামকুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত লেখকদের রচনাধারার মধ্যে সুবোধ ঘোষের এই গল্পটি অনন্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পত্তনকালে সমাজের প্রান্তবাসীদের প্রতি লেখকদের সহমর্মিতা প্রকাশ পেলেও এর যথার্থ পরিচর্যা শুরু হয় চল্লিশের দশক থেকে। বহু গল্পের ভিড়ে আমাদের মনে পড়তে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'সারেঙ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়', সমরেশ বসুর 'শানা বাউরীর কথকতা', মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা', রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'ঢোলসমুদ্র' বা সুভাষ কর্মকারের 'কাঠ' গল্পের কথা। কখনও একক ব্যক্তিচরিত্র আবার কখনও গোষ্ঠী হিসাবে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের জনপদজীবনের ছবি এ-সব গল্পে ফুটে উঠেছে। জীবনযুদ্ধের নানা বিপ্রতীপতায় এ-সব গল্প ঋদ্ধ। এ-সমস্ত গল্পে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা ক্ষেত্র সমীক্ষায় 'সভ্যতার পিলসুজ' হিসাবে পরিচিত না-হলেও 'মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক'[২] তো বটেই। অখ্যাত, অপর বা নিম্নবর্গের এই আখ্যানগুলো অধুনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আদৃত হবার যোগ্য। এই প্রেক্ষাপটে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' আমাদের কাছে এক নতুন বার্তা বয়ে আনে, উন্মোচিত হয় সমাজ-ইতিহাস চর্চার এক নতুন দিগন্ত। আদিবাসীজীবনের গভীরতার প্রতি সুবোধ ঘোষের আকৈশোর আকর্ষণ এবং সংশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি এই গল্পে সমাজ-ইতিহাসের বাস্তবতাকে অনুষঙ্গ করে প্রকাশ পায়। ঔপনিবেশিক ভারতের রেনেসাঁলোকিত দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চ ও লোকায়ত সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক রসায়নের বিশ্লেষণ যখন এই গল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলে তখন তার আখ্যান আধুনিক তত্ত্ববিশ্বের নানা নির্মাণ-নিরিখে বিশ্লেষিত হতে পারে। স্টিফেন ওরফে রুন্নু হোরো এবং ফাদার লিন্ডনের অসম যুদ্ধ নিম্নবর্গীয় চর্চায় একটি বিশেষ মাত্রা পায়।

এখানে বলে রাখি 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' প্রথমে প্রকাশিত হয় 'মন্দির' পত্রিকার ১৩৫১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৯৪৪)। এরপর তা সুবোধ ঘোষের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় (১৯৪৯)। গল্পটি সম্পর্কে আর একটি তথ্য এই যে, সুবোধ ঘোষের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা গ্রন্থ 'ভারতীয় আদিবাসী'র অন্তর্গত 'একটি বিরসাপন্থী যুবকের কাহিনী'তেও হোরোর কথা আছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৮-এ। সেখানে 'জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসী' শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায়ে হোরোর প্রসঙ্গ এবং সংলগ্ন সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এ-কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলটিকে চিনে নেওয়া। ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় সংগ্রামের সামাজিক সত্যটিকে তিনি আত্মস্থ করতে করতে চলেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আশৈশব আদিবাসী সমাজকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে হাজারিবাগে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকে প্রথম যৌবন এখানেই কেটেছে। তাঁরই কথায় 'ছেলেবেলা থেকে

Scanned with OKEN Scanner

শালবন, পাহাড় আর জংলী ঝরনা -- নদীর সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আমার জীবনে একটি মহৎ সঞ্চয়।"[৩] শুধু তা-ই নয়, লেখক হবার আগে জীবনের আলো-ছায়া এবং অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখার অভিজ্ঞতা সুবোধ ঘোষের হয়েছিল। রুজি রোজগারের জন্য হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস স্কুলে পড়বার সময়ই তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল, এর আগে সন্ন্যাসী সেজে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও এসেছেন। তারপর হাজারিবাগ, মুম্বাই হয়ে কলকাতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে স্থিতিলাভ। এরপর 'অনামীসঙ্ঘ' থেকে অযান্ত্রিক দিয়ে যাত্রা শুরু, দ্বিতীয় গল্প ফসিলেই চলে এল প্রান্তিক সমাজের মানুষজন। তবে অনামী চক্রের ঘনিষ্ঠ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রতি মোহ অচিরেই তাঁর ভেঙে গিয়েছিল এবং বছর দুয়েকের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ। ১৯৪৪-এ এই ঘটনা যখন ঘটছে তখনই লেখা হচ্ছে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' এবং 'ভারতীয় আদিবাসী' গ্রন্থের লেখাগুলো।

এই দুয়ের মধ্যে কোনো বিশেষ যোগাযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ অনামীসঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনোই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছিল না আর পরাধীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অনুন্নত অবস্থা তথা সামাজিক বৈষম্য কম্যুনিস্টদের 'জনযুদ্ধ নীতি'কে সমর্থন জানানোর মতো প্রেরণা তাঁকে দিতে পারেনি। তবে ৩৪ বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় তাঁর হৃদয়ে যে-ভারতবোধের উদয় হয়েছিল তার সঙ্গে হাজারিবাগকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মিশেলে হোরো মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের হিরোকে যখন আমরা বিরসাপন্থী যুবকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি তখন এর বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। সন্দেহ থাকে না যে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে লেখক দুই অসম শক্তির যুযুধান অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গল্পটির পাশাপাশি আমরা যখন বিরসাপন্থী যুবকের কাহিনি পড়ি তখন বুঝি শুধু চোখের দেখাতেই শেষ নয়, সম্পর্কের বিশ্লেষণেও সুবোধ ঘোষ অসাধারণ।

প্রসঙ্গত আমরা 'ভারতীয় আদিবাসী' গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করব -- প্রথমটি 'খৃষ্টান মিশনারি ও আদিবাসী', দ্বিতীয়টি 'ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আদিবাসী' আর তৃতীয়টি 'জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসী'। এই সমস্ত অধ্যায়ে সুবোধ ঘোষের উপলব্ধি তাঁকে যে-সত্যে পৌঁছতে সাহায্য করেছে তা একান্তই মানবিক, আদিবাসীদের কাছ থেকে দেখার সূত্রে তাদের প্রতি অপার প্রেম থেকে জাত। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মতোই তিনি প্রথম অধ্যায়টিতে ভারতবর্ষে মিশনারিদের কর্মকাণ্ডের আন্তর স্বরূপটি বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের শিক্ষামূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করেও সে-সমস্ত কাজের অভিসন্ধিমূলক অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। জনকল্যাণমূলকতার পিছনে যে একটা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য' ছিল তা এই 'সমাজবিজ্ঞানী'র দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তাঁর বিশ্লেষণে ধরা পড়ে,-- "খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদ যে একটা অতি উচ্চমানের আদর্শ, খ্রিষ্টান পাদরিসমাজ সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষের মানুষ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে এবং ইংরেজ শাসনে থাকলে উন্নত হবে, এই বিশ্বাস খ্রিষ্টান পুরোহিতরা আন্তরিকভাবেই পোষণ করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা উপলব্ধি করলেন, ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তাদের ধর্মপ্রচার কখনই প্রসার লাভ করতে পারবে না। এরপর তারা অবনত হিন্দুসমাজের দিকে ধাবিত হয়। সামান্য সফল হলেও আশানুরূপ হয় না। তারপর বিচ্ছিন্ন দরিদ্র নিরক্ষর চরম হতাশাগ্রস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তারা দৃষ্টি দেয়, সফল হয়, আদিবাসী সমাজের এক বৃহৎ অংশকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে।"[৪] যাদের এভাবে ধর্মান্তরিত করা হল তাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ নিশ্চয়ই মিশনারিসমাজ আশা করেনি। সুবোধ ঘোষ দেখেছেন, ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় আদিবাসীরা জমির দখল ক্রমেই হারিয়ে ফেলছিল, নতুন ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে জমা হচ্ছিল ক্ষোভ। মিশনারিরা এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যকে তো সফল করেইছিলেন, সেইসঙ্গে আদিবাসীদের মুক্তিচেতনাকেও বোধহয় পরোক্ষে মদত দিয়ে ফেলেছিলেন। তাই আদিবাসীদের একাংশের চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিতর প্রাণিত থেকেছে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব। বৈদেশিক খড়্গের বিরুদ্ধে তারা মাথা উঁচু করে সংগ্রামে সচল থেকেছে -- কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, রজমহলের পাহাড়ি বিদ্রোহ কিংবা ভীলদের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ সে-কথাই স্মরণ করায়।[৫]

'ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আদিবাসী' অধ্যায়ে সুবোধ ঘোষ এ-সবের সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত বিবরণ ও মতামত পেশ করেছেন। প্রসঙ্গত একটি ঐতিহাসিক সত্য তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন,-- "আদিবাসীদের সম্পর্কে অতীত ব্রিটিশ নীতি এবং বর্তমান ব্রিটিশ নীতির আকাশ-

Scanned with OKEN Scanner

পাতাল পার্থক্য। একদিন সাম্রাজ্যিক স্বার্থের খাতিরে আদিবাসীদের নিভৃত অরণ্য এলাকায় সমতলবাসী হিন্দুকে গরজ করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আর আজ একটা বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করে হিন্দুদের কাছ থেকে আদিবাসীকে পৃথক করে রাখবার চেষ্টা, কারণ আজ হিন্দু আর নিতান্ত ব্রিটিশের আমলা নয়, হিন্দু ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠক ও প্রচারক, সম্রাটদ্রোহী।"[৬]

বোঝা যাচ্ছে, সুবোধ ঘোষ খুব ভালো করেই ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক-ঐতিহাসিক-রাষ্ট্রিক বিবর্তনের মূল স্বরূপকে আত্মস্থ করেছিলেন। ফলে বিরসা মুন্ডার প্রতিবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি গান্ধীপ্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসতে পারেন অনায়াসে। তিনি দেখেছিলেন যে, বিরসা প্রথমে অহিংস নীতির দ্বারাই একটা আদর্শসম্মত সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন সমাজকে। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের তিনিই প্রথম প্রবর্তক। বলা বাহুল্য, এই অহিংসা নীতি পরবর্তী কালে গান্ধীজিও গ্রহণ করেছিলেন। তাই লেখক বলেন যে, বিরসা মহাত্মা গান্ধীর পূর্বরূপ। অবশ্য বিরসা আন্দোলনে সম্পূর্ণ অহিংসার আদর্শ শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকেনি, এক চরম পরিণামে তা বিধ্বংসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল— যা কিনা লেখকের মতে অগাস্ট আন্দোলনের পূর্বরাগ।[৭]

গল্পে এই অহিংস আন্দোলনের প্রসঙ্গ আসে এবং আদিবাসী নেতার কাছে বিরসা আর মহাত্মা যে সমার্থক তা-ও লেখকের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়,— 'সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ'।[৮] গল্পে হোরোর আচরণ সুবোধ ঘোষের এই সত্য ধারণাকেই স্পষ্ট করে যে, আদিবাসীদের গণসংগ্রাম, খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ-প্রবণতা তাদেরকে এক প্রকার জাতীয়তাবোধের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। 'জাতীয় সংগ্রামে আদিবাসী'তে সে-কথাই লেখকের নির্ভুল বিশ্লেষণে উঠে আসে। মনে রাখতে হবে আদিবাসীদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ কোনো কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন ছিল না। সভ্য ভারতবর্ষের কাছ থেকে এ-সংগ্রামে আদিবাসীরা কোনো সহায়তা পাননি। এই সত্যকে লেখক যেমন গল্পে তেমন গবেষণামূলক লেখাটিতেও বলে ফেলেন। ছোটবেলায় মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগে ইতিহাস-দর্শনের যে-চর্চা লেখক করেছিলেন তারই সূত্রে এটা তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল যে, নিজেদের মুক্তি-প্রেরণাতেই ঔপনিবেশিক ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোতে স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রজার বিক্ষোভে আদিবাসীরা শামিল হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত সুবোধ ঘোষ দেখান মিশনারিদের বর্বরতার দিকটিকেও, লেখা হয় 'একটি বিরসাপন্থী যুবকের কাহিনী'। সেখানে বর্ণিত হয় এক বিরসাপন্থী আদিবাসী যুবকের প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানের কথা, যা ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পটির শিল্পবৃত্তে। ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের খাতিরে তিনি বর্ণনা করেন জার্মান ধর্মযাজক জন গসনারের কথা। জার্মানির ইভ্যানজেলিস্ট ধর্মযাজক জন গসনার এবং তাঁর অনুগামী চারজন শিষ্য নেটিভদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঁকা পথ ধরলেন, বৈষয়িক উন্নতির ভরসা দিলেন। দরিদ্র আদিবাসী, অর্ধভুক্ত মুন্ডা ওরাওঁ আদিবাসী খিদে থেকে বাঁচবার প্রেরণায় ধর্মান্তরিত হতে লাগলেন। এই অমানবিক তঞ্চকতায় সহায়তা করলেন ছোটনাগপুরের কমিশনার কর্নেল ডালটন, সি.ডাবল্যু বট্‌ম্‌ প্রমুখ প্রশাসক। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মতোই সুবোধ ঘোষ এই অধ্যায়ে মিশনারিদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই মানসিকতার পেছনে সক্রিয় ছিল তাঁর সমাজবিজ্ঞাননির্ভর মানবিক কথাসাহিত্যিক চেতনা।[৯] লক্ষণীয় যে, এই গসনারই একটু ভিন্ন রূপে গল্পে ফাদার লিণ্ডন হিসাবে আবির্ভূত হন। স্বার্থপ্রণোদিত বাঁকা পথে দৃঢ়চেতা হোরোকে বশে আনার চেষ্টা করেন, বিফলতাকে ঢাকতে বর্বরতার আশ্রয় নেন, তারপরও অক্টোপাসের জাল ছড়িয়ে দেন আদিবাসী সমাজের গভীরে। হোরোকে দারোগা বানিয়ে দেবার টোপ, বুড়ো সোখার ডিহিতে পুলিশি অভিযান চালানো আর চিরকি মুরমুকে হাজারিবাগ মিশনারিতে এনে রাখা লিন্ডনের স্বার্থচেতনারই চিহ্ন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের কথা। রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন, "যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়।"[১০] একই ঘটনা ঘটে ফাদার লিণ্ডনের ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদী অহমিকার উচ্চতা থেকে অপরের অজ্ঞানতা দূর করার কূট প্রণালি তাঁর মতো মিশনারিরা গ্রহণ করেছিলেন বলেই হোরোদের সঙ্গে যুদ্ধ-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে শক্তি-বুদ্ধির খেলায় আদিবাসীদের পরাজয় অনিবার্য। এইভাবে সুবোধ ঘোষ নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞাননির্ভর অকপট প্রেরণার সাহায্যে নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে। সেইসঙ্গে উত্তরকালের হাতে তুলে দিয়েছেন ভাবনাবৃত্তে নতুন পরিসর তৈরির রসদ।

এখানে বলে রাখি, শতবর্ষ অতিক্রান্ত সুবোধ ঘোষ বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলের বাইরে তেমন ভাবে আলোচিত নন। সাম্প্রতিক কালে তাঁর গল্প-উপন্যাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা হয়েছে, গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু গল্পকার হিসাবে উত্তরকালের কাছে তিনি যে-অভিনিবেশ দাবি করেন তা এখনও দেখা যায়নি। এখন পর্যন্ত আলোচ্য গল্পটি নিয়ে বড় আলোচনা পাওয়া গেছে একটি। কিন্তু সেখানেও গল্পটির কোনো কোনো দিক অধরা, অনালোচিত রয়ে গেছে। অন্যান্য কয়েকটি আলোচনাও আংশিকতায় আক্রান্ত। আমরা বর্তমান আলোচনায় এর একটি পূর্ণায়ত বিশ্লেষণ করতে চাই। তবে তার আগে গল্পটি নিয়ে যে-কথাগুলো বলা হয়ে গেছে সেই মন্তব্যগুলোকে আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এখানে উল্লেখ করব।

(১) জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'গল্পটিতে ভারতের আদিবাসীদের আবাস-ভূমিতে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের অভিযান এবং সে উৎপাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অরণ্যবাসীদের পরাজয়ের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।' [১১]

(আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী : ১৯১)

(২) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় গল্পটিকে স্বাধীন ভারতে আজও পিছিয়ে-থাকা আদিবাসীদের জীবনযন্ত্রণার অসামান্য রূপায়ণ হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে এটি 'মধ্যবিত্ত পাঠকের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও পাটোয়ারি বুদ্ধির উপর লেখকের চপেটাঘাত।'[১২]

(কালের পুত্তলিকা : ৩৭১)

(৩) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'সুবোধ ঘোষের গল্প ঃ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক লেখায় বলেছেন যে, আদিবাসীদের অনাত্মীয় করে ভারতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলেই তাদের পরাজয় সহজ হয়ে উঠেছে।[১৩]

(গল্প পাঠকের ডায়রি : ১৫৩)

(৪) সুমিতা চক্রবর্তীর মতে এটি পরাধীন ভারতের একটি রক্ত-ফেটে-পড়া গল্প। এখানে ইতিহাস, নৃতত্ত্বআর আধুনিক ভারতীয় সমাজকে অচ্ছেদ্য একসূত্রে বেঁধেছেন লেখক।[১৪]

(ছোটগল্পের বিষয় আশয় : ২৪৮)

(৫) তপন মণ্ডল বলেছেন, গল্পটিতে গল্পকারের প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্য, আদিবাসীদের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি, ইংরাজ-শাসিত ভারতে 'খ্রিশ্চান' পাদরিদের প্রতি চাপা রোষ এবং হিন্দুত্বের মর্যাদাভিমানকে দারুণভাবে আঘাত হানা হয়েছে। কিন্তু শান্তভাবে, প্রায় নাটকীয়তা বর্জন করে। তাঁর আরও মন্তব্য, '... গল্পটির সমস্ত সমস্যাটাই মোটামুটিভাবে হিন্দুর সামাজিক সমস্যা এবং আদিবাসী সমস্যা তারই একটি সমস্যা মাত্র।'[১৫] (গল্পকার সুবোধ ঘোষ : জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণশিল্প : ৭৫-৭৬)

(৬) প্রসূন ঘোষ একে দেখেছেন 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির যথার্থ স্বরূপ ও প্রান্তিকায়িত জনতার আন্দোলনের নিজস্ব চরিত্রের উন্মোচন'-এর গল্প হিসাবে। [১৬]

(সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী : ৬১)

(৭) দেবলীনা মুখোপাধ্যায় আগামী পানিপথের যুদ্ধ জিতে নেবার নেশায় আক্রান্ত হোরোর গল্পে বিজিত অনার্য ভারতবাসীর বঞ্চনার করুণ ইতিহাসকে দেখতে পান।[১৭]

(সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী : ১৪৫)

(৮) কাননবিহারী গোস্বামীর মতে এই গল্প 'ঔপনিবেশিক খ্রিষ্টান যাজকদের ও শাসকদের কাছে অরণ্যের আত্মার পরাভব।'[১৮]

(বাংলা ছোটগল্প ঃ পর্ব-পর্বান্তর : ১৩৯)

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' সম্পর্কে আলোচকেরা একটা নির্দিষ্ট ধারায় অবগাহন করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অসার্থক না-হলেও নিম্নবর্গ চেতনার উপরিতলেই বিচরণ করেছে। নিম্নবর্গের যথার্থ প্রতিবেদন নির্মাণে তা সফল হয়নি। আমাদের লক্ষ্য, স্টিফান হোরোর বক্তব্যের মাধ্যমে নিম্নবর্গের নির্মাণকে দেখা। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বহির্ভূত এবং একটি নির্দিষ্ট ভূমিসংলগ্ন আদিবাসী সত্তা কী বলতে চায়, তা যদি লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন তবেই তা ইতিহাসের দলিল হয়ে ওঠে। সেটাই হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং তার আলোচনা যথার্থ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখতে চাইব সুবোধ ঘোষ তেমন কোনো দলিল নির্মাণের সুযোগ আমাদের দিতে পেরেছেন কি না। কারণ ইতিপূর্বে আমরা তাঁর আদিবাসী সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছি এবং জেনেছি, প্রথাগত পড়াশোনা না-থাকলেও সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ঈর্ষণীয়। অবশ্য গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বক্তব্য অনুসরণে আমরা বলতে পারি নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বার করে আনা যথেষ্ট কষ্টকর।[১৯]

যা-ই হোক, এ-যাবৎ গল্পটি নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি লেখক প্রদর্শিত কিছু উপরিতলের চিহ্নকে আশ্রয় করেই শ্রেণিসম্পর্কের বিষয়টিকে আলোচকেরা গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এমনও

Scanned with OKEN Scanner

কিছু চিহ্ন উপেক্ষিত রয়ে গেছে যা কেবলমাত্র শ্রেণিসম্পর্কের কথা না-বলে গল্পটিকে নিম্নবর্গের আখ্যান হিসাবে গড়ে তুলতে আদর্শ সহায়ক রূপে বিবেচিত হতে পারে। সেইসঙ্গে স্বয়ং লেখক এ-বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন, তিনিও গল্পোদ্ধৃত চরিত্র লেপো থানার দারোগা তথা স্টিফান হোরোর সহপাঠী ঘোষের মতো নিছক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অংশীদার হিসাবে রয়ে গেলেন কি না ইত্যাদি বিষয়গুলোও আমাদের আলোচনায় আসবে।

'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' শুরু হয় ঘোষ দারোগার স্মৃতিচারণে। অসহযোগ আন্দোলনের কাল গল্পটির অন্তর্বৃত সময়। ছোটনাগপুরের জংলি প্রকৃতির কোলে সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খাল্‌খো, জন্‌ বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু, স্টিফান হোরোদের মতো ওরাওঁ আর মুন্ডা জনজাতির মধ্যে গল্পের পরিসর। স্মৃতিচারণ পর্বে এই পরিসর গড়ে উঠেছে ফাদার লিন্ডনের মিশনারি স্কুলকে কেন্দ্র করে আর গল্পের পরিণামী অংশে কথকের পরিসর তৈরি হয়েছে লেপো থানাকে ঘিরে। আট বছর ধরে এই গল্পের ব্যাপ্তি। দারোগা ঘোষ এই গল্পের কথক। তারই বর্ণনায় এখানে ত্রিপাক্ষিক যুদ্ধের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। প্রথম পক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর ফাদার লিন্ডন, দ্বিতীয় পক্ষ আদিবাসী অপর তথা ফাদারের প্রিয় ছাত্র স্টিফান হোরো এবং তৃতীয় পক্ষ ইন্টার ক্লাস পরিবারের বাঙালি ও বিহারি ছাত্রদল। এই ত্রিপাক্ষিক বৃত্তসংলগ্ন হয়ে আছে আরও তিনজন— সংস্কৃতের শিক্ষক বিহারি পণ্ডিতজি, রিচার্ড টুডু আর স্টিফানের প্রেয়সী চিরকি মুরমু। ঘোষ দেখেছে স্টিফানের উত্থান আর পতন, কখনও দূর থেকেই তার ভাবনার শরিক হয়েছে— কখনও তাকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছে। কখনও তার আচরণে খুশি হয়েছে আবার বিপরীত পরিস্থিতিতে হতাশাও প্রকাশ করেছে। কিন্তু ঘোষ সমেত বাঙালি-বিহারি ছাত্রসমাজের সমস্ত ভাবনাই নিখাদ দূরাবলোকন। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অবলম্বন করে তারা স্টিফান হোরোর চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই নির্লিপ্তিই আদিবাসী সমাজ তথা ভারতবর্ষের বিপর্যয়ের কারণ -- গল্পের শেষতম মন্তব্যে সুবোধ ঘোষ যেন সেই কথাটাই বলতে চান। লেপো থানার দারোগা ঘোষ বলছেন,— "কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল, হয়তো আমরাই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়েছিলাম।"[২০]

মধ্যবিত্তের নিরপেক্ষতা একটি রাজনৈতিক সত্যের উপর লেখকের তীক্ষ্ণ কশাঘাত।

তবু এটাই গল্পের একমাত্র স্বর নয়। মধ্যবিত্ত আপাতভাবে এই গল্পে যুদ্ধের দর্শক হলেও তারা এই যুদ্ধেরই অংশীদার। তাদের আপাত-নিষ্ক্রিয়তা হোরোর বিপর্যয়ের সক্রিয় কারক। কারণ হোরো রয়েছে ফাদার লিন্ডন, পণ্ডিতজি এবং ঘোষেদের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের বাইরে। সে-ই নিম্নবর্গচেতনার 'অপর' বা সাবঅলটার্ন। আর ঘোষ বা পণ্ডিতজি আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাইরের বৃত্তে থাকলেও উচ্চ সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসাবে তারই একটা অংশ। ঠিক এই জায়গাটাতেই ইতিপূর্বে উল্লিখিত সমালোচকেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা সাঙ্গীকৃত আধিপত্যকামী শক্তিকে (বা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি) আলাদা করে দেখেছেন। তাই ঘোষ বা পণ্ডিতের সঙ্গে স্টিফানের 'যুদ্ধ'টা তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। অন্যদিকে আজকের তত্ত্বদৃষ্টি দিয়ে দেখাটা সুবোধ ঘোষের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তবু তিনি নিম্নবর্গ নির্মাণের আয়ুধ তৈরি করেন এভাবে—

(১) 'টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম— টুডু চট্‌ করে এক দৌড়ে এই এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এস তো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে। স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান দেড় মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে পোড়া হরিণের মতো উদ্দাম বেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝালবাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম— কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছো না।'[২১]

—তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি না-হলেও 'হেজেমোনিক' দৌরাত্ম্য এখানে খুব সহজলক্ষ্য। ইন্টারক্লাস পরিবারের কূটকচালিতে যে-সত্তা বিপর্যস্ত এবং নির্বাক সে-ই 'অপর'। লেখকের এই বর্ণনা সেই অপরসত্তা নির্মাণে সহায়তা করেছে। অথচ আগের কোনো লেখায় যদি এই আধিপত্যের প্রসঙ্গ এসেও থাকে, রিচার্ড টুডু সেখানে ব্রাত্য। সে-সব লেখায় মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' কেবলমাত্র হোরোরই ব্রাত্য জীবনবৃত্তান্ত। এরপর লেখক যখন বলেন, 'এই ফাঁকা কথার কারসাজীটাকে আন্তরিক অভিনন্দন মনে করেই টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসতো', তখন আমাদের মনে হয় তিনি কিছুটা অজান্তেই হয়তো-বা আধুনিক চিন্তাবীজের

Scanned with OKEN Scanner

কাছাকাছি পৌঁছে যান। কারণ টুডুর 'গর্বভরে' হাসাটা ঔপনিবেশিক ডিস্‌কোর্সের তৈরি করা হাসি। এই গল্পে টুডু আগাগোড়া আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকার করে এক নিরন্তর পর্যবেক্ষক হিসাবে চিত্রায়িত। তার নিজস্ব স্বর এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং উপনিবেশের ভাষাই (পড়ুন গর্বের হাসি) তার অভিব্যক্তি প্রকাশের ভাষা হয়ে ওঠে। টুডু হয়ে ওঠে এক আদর্শ 'অপর'। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত, লেখক সুবোধ ঘোষও নিম্নবর্গকে নির্মাণ করেছেন। টুডু সম্পর্কে 'গর্ব' শব্দের ব্যবহারই এই নির্মাণের মূল প্রক্রিয়া।

যা-ই হোক, আমরা ফিরে যাই ঘোষের প্রসঙ্গে। শুধু টুডু নয়, হোরোও তার নিম্নবর্গ নির্মাণপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত। তার চিহ্নগুলো এ-রকম—

(ক) ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় বেশি নম্বর পাওয়ায় সে বিহারি ছাত্রদের নিয়ে হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্র করে।

(খ) হোরোকে সে বনভোজনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভাবে, 'খেয়ে খুশি হবে হোরো। একবারে আনকোরা মুণ্ডা, জীবনে বোধহয় এসব খায়নি কখনও।'

(গ) স্কুলের ফটকে পিকেটিংকে অগ্রাহ্য করে হোরো ভিতরে ঢুকে গেলে সে বলেছিল,— 'সেইদিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিনলাম। পাদরিদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো।'

— হোরোর সম্পর্কে এই মনোভাব এবং উক্তিগুলো যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে তা অবশ্যই আধিপত্যকামী এবং শ্রেণিসচেতন। উচ্চ সংস্কৃতির ধ্বজাধারী মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্র ঘোষ তার স্বতন্ত্র অবস্থানকে জানাতে ভোলেনি এই মন্তব্যগুলোতে। উপরন্তু সে তার নিজের ভাবনাগুলোকে হোরোর মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। অর্থাৎ হোরো কী করবে, হোরো কী দেবে সেটা ঘোষের ভাবনা অনুযায়ী যেন হবে। হোরোর ভাষ্য যেন সে-ই নির্মাণ করে। চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত, হোরো চিরকি মুরমুর কাছে ফিরে যাবে ইত্যাদি উল্লেখ সে-কথা সমর্থন করে। এইভাবে ঘোষ প্রভুত্বকামী ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনের অংশীদার হয়ে যায় এবং নিম্নবর্গ নির্মাণক্রিয়ায় যোগদান করে।

(২) 'স্টিফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরাজি ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খ্রিষ্টান টিচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিন্ডন ক্ষুণ্ণ হলেন, পণ্ডিতজি অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনার্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হল না। পণ্ডিতজি আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন— স্টিফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে। পণ্ডিতজি হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হল— পণ্ডিতজিকে যেন খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।..... পণ্ডিতজি মিনতি করে বললেন— স্টিফান হোরো এত ভালো সংস্কৃত লিখেছে, এ-তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুশি হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হল সংস্কৃত ভাষার জয়।'[২২]

— উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হল। কিন্তু নিম্নবর্গ নির্মাণে পণ্ডিতজির অবস্থানকে বুঝতে গেলে এই উল্লেখ আমাদের প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক উচ্চসংস্কৃতির ডিসকোর্সে এই পণ্ডিতজিও ফাদার লিন্ডনের সমধর্মী অন্যতম সত্তা। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির সহযোগী ভাবনা আর্য সংস্কৃতি। পণ্ডিতজি যখন হোরোর সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়াকে 'সংস্কৃত ভাষার জয়' হিসাবে দেখেন তখন এই মতটিই প্রতিষ্ঠা পায়। ফাদার লিন্ডন যেমন হোরোর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে নানা তঞ্চকতার আশ্রয় নেন, তেমনি হোরোর সংস্কৃত পড়ার অটল প্রতিজ্ঞায় পণ্ডিতজির যে কোনোই হাত নেই তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। খুশি জাহির করার প্রসঙ্গে পণ্ডিতজির ব্যবহারে যে-আত্মগর্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে তাতে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে তিনিও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের তাঁবুতে নিজের আসন. পেতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ফাদার ও পণ্ডিতজির অবস্থান ঔপনিবেশিক শাসনকালে বিপরীত মেরুর হলেও অন্যপ্রান্তে যখন সাংস্কৃতিক অপর হিসাবে হোরো রয়েছে তখন দুজনে একই ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনের অংশ। ফাদার যেমন হোরোর উপর থেকে সব রকমের বিধিনিষেধ তুলে নেন, তার সঙ্গে টেনিস খেলেন ও চা-বিস্কুট খাওয়ান, ঠিক একই উদ্দেশ্যে পণ্ডিতজিও তাকে সংস্কৃতে সবচেয়ে বেশি নম্বর দেন। এইভাবে অপরতার অনুভবকে সামনে রেখে তাঁরা দুজনেই নিম্নবর্গ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। নিম্নরেখ অংশ দুটিকে আমরা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের একজন হিসাবে পণ্ডিতজির উপলব্ধির চিহ্ন বলতে পারি।

হোরোর কি কোনো বক্তব্য আছে? নিম্নবর্গ নির্মাণের প্রসঙ্গে হঠাৎ এ-রকম একটি প্রশ্ন তুললে পাঠক অবশ্যই বিব্রত হবেন। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে, নিম্নবর্গ চর্চার সূচনাপর্বে তাদের প্রকৃত স্বরূপ বার করাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। নিম্নবর্গীয় সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ

Scanned with OKEN Scanner

আকৃতির ধারণা গড়ে তোলাই ছিল চর্চার মূল কথা। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর একটি প্রবন্ধে বললেন যে, নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না।[২৩] সুতরাং তাদের স্বরূপ নির্ণয় গুরুত্ব পেতে পারে না। তিনি বললেন, 'নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলোকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা।'[২৪] অতএব এরপর থেকে প্রাপ্ত দলিলগুলোর খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে দেখা হতে থাকল 'নিম্নবর্গকে রিপ্রেসেন্ট করা হয় কীভাবে'। এ-প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গের ধারণার নির্মাণ— এই বিষয়টি 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর গোড়া থেকে চর্চিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তখন অনুমানটি এমন ছিল যে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলসটা খসে পড়বে, প্রকৃত নিম্নবর্গের স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এই অনুমানটি যে ভুল, রিপ্রেসেন্টেশনের গণ্ডি অতিক্রম করে কোনো এক প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপলব্ধিতে পৌঁছনো যে অসম্ভব, এটা একবার স্বীকার করে নেওয়ার পর খাঁটি আগমার্কা নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার সদিচ্ছাটুকুও আর পোষণ করা সম্ভব ছিল না।"[২৫]

— বর্তমান আলোচনাটি অবশ্যই নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য নয়, তবু সমাজ-ইতিহাসের দলিল হিসাবে গল্পটিকে যখন বিশ্লেষণ করছি তখন নিম্নবর্গের নির্মাণ প্রক্রিয়ার কথা এসেই যায়। সেজন্যই আমরা প্রভুত্বকামী প্রতিবেদনে পণ্ডিতজি, ঘোষ ও ফাদার লিন্ডনের এই নির্মাণপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ছবি দেখছিলাম। আর এরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রশ্নটি এসেছিল — হোরোর কি কোনো বক্তব্য আছে? কিংবা হোরোর কি কোনো ব্যক্তিগত স্বর আছে? না সবই উচ্চবর্গের নির্মাণ? আমাদের ধারণা, সুবোধ ঘোষ যদি জীবিত থাকতেন তবে তিনি হয়তো শ্রীমতী চক্রবর্তী বা শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করতেন, 'নিম্নবর্গের কি কোনো বক্তব্য নেই? হোরোর কি কোনো ব্যক্তিগত স্বর নেই?' তাঁর প্রশ্নের যৌক্তিকতা বোঝাতে তিনি হয়তো নিম্নোদ্ধৃত নিদর্শনগুলো তুলে ধরতেন, যা আমরাও সমর্থন করি প্রাথমিকভাবে।

(ক) 'আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে স্টিফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে।'

(খ) 'তবু অনার্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হল না।'

(গ) 'বাইবেল ক্লাসের একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিন্ডন বারবার পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন — স্টিফান তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

— জানি না স্যর। স্টিফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, স্টিফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।'

(ঘ) 'জয়ধ্বনি করে আমরা হোরোকে অভ্যর্থনা জানালাম। হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বন শুয়োরের মতো গোঁ গোঁ করে পথ করে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল।'

(ঙ) 'আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে, ঘোষ। তাই বিরসা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন।'[২৬]

— নিম্নরেখ উদ্ধৃতি এবং অভিব্যক্তিগুলো থেকে আমরা হোরোর প্রতিবাদী স্বরটিকে সহজেই চিনে নিতে পারি। সম্ভবত এটা দেখেই কোনো কোনো সমালোচক অসম সংগ্রামে এই দৃঢ়চেতা নায়কের যুদ্ধজয়ের কথা বলেছিলেন। তাহলে এটা স্বীকার করতে হয় যে নিম্নবর্গেরও কিছু বলবার থাকে। এবং অবশ্যই সেই বক্তব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

এই-যে প্রতিবাদ, এই-যে বিরোধ বা আধিপত্যকামী শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো— তার মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে। কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করার মতো রসদ বা অবস্থা আদিবাসী সমাজে তৈরি হয়নি। মার্ক্স বলেন যে, বাস্তব ভিত্তির অভাবেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ও সুসংগত কোনো ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে না, আর সেজন্যই তা মগ্ন হয়ে থাকে অলীক রাষ্ট্রবাদের দিবাস্বপ্নে।[২৭] মার্ক্সের এই বক্তব্য সমর্থন করেন এ-সময়ের প্রথিতযশা সাবঅলটার্ন বিশেষজ্ঞ রণজিৎ গুহ। তিনি বলেন যে, রাজধানী ও শহর থেকে দূরে গ্রাম ও মফস্‌সলে যারা থাকে তাদের চোখে রাষ্ট্রের সামগ্রিক চেহারাটা সহজে ধরা পড়ে না। তারা রাষ্ট্রশক্তিকে দেখে তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার গোস্পদে। আর তাদের ধারণায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে তা তারা ভরে দেয় ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক

Scanned with OKEN Scanner

বিশ্বাস দিয়ে। এইভাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে-ধারণা তারা গড়ে তোলে তা অলীক, ক্ষমতার যে-নিয়মের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত সেটা নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের সংজ্ঞায় সাজানো কোনও সংবিধান নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মচিন্তার দ্বারা।[২৮]

'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে স্টিফান হোরো কি তেমনই এক অলীক রাষ্ট্রের ভাবনায় আচ্ছন্ন নয়? পাশ্চাত্য শিক্ষায় তার পরিশীলিত মন টুডু সম্পর্কে ঘোষেদের কথার ফাঁকটুকু বুঝতে পারে, ফাদার লিন্ডন ও পণ্ডিতজির সাংস্কৃতিক কূটাঘাত তাকে পরস্পরবিরোধী আচরণে লিপ্ত করে। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না লড়াইটা কার বিরুদ্ধে করতে হবে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রশক্তির চেহারাটা তার কাছে স্পষ্ট নয়। আমরা জানি শক্তির কোনো কেন্দ্র যদি তৈরি না-হয় তবে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশও সম্ভব হয় না। নিম্নবর্গের নির্মাণপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বিপরীতমুখী ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হোরোর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। ফাদার, পণ্ডিত বা ঘোষেদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে গিয়ে জঙ্গলকেই সে প্রকৃত রাষ্ট্র হিসাবে ভাবে। সেই অলীক বা তার কল্পিত রাষ্ট্রে বুড়ো সোখার সঙ্গে সে যোগ দেয়, অরণ্য সম্পর্ককে কায়েম রাখতে খ্রিষ্টান হয়েও সে মাদল বাজায় আর বিশ্বাস রাখে বিরসা ভগবানে — যিনি একাধারে গান্ধী ও জিশুখ্রিষ্ট, হয়তো-বা 'ধরতি-আবা'ও[২৯]। সে স্কুলের সম্পর্ক ছেড়ে 'বিরসাইট্' হয়ে যায়। শ্রীগুহ অলীক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় যে-ধর্মচিন্তাকে দেখেন, হোরোর কাছে তা প্রথমত 'দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্রা' বুড়ো সোখার দেখানো পথ আর পূর্ণত জিশুখ্রিষ্টের মতো দেখতে বিরসা ভগবানের বাণী। সেই বাণীকে শিরোধার্য করে হোরো ফাদার লিন্ডনের মতোই 'ধর্মযুদ্ধে' লিপ্ত হয়। লেপো থানায় দারোগা ঘোষের কাছে হাজিরা দিয়ে হোরো যখন বলে, 'আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে, ঘোষ। তাই বিরসা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন', তখন আমাদের বুঝতে হবে 'আমাদের জঙ্গল'টা আসলে তার রাষ্ট্র — যার অধিকার, হোরো ভাবে, একমাত্র তাদেরই আছে। তাই বিরুদ্ধ-ক্ষমতার কেন্দ্র তার কাছে 'পাপ', পাপক্ষালন তার ধর্মযুদ্ধ এবং তার এই চিন্তার নিয়ন্ত্রক বিরসা ভগবান নামক ধর্মচিন্তা। এই বিরসা ভগবান হোরোর কাছে কালাতীত এক বিশ্বাস— এই বিশ্বাসটাই তার ধর্ম।

রণজিৎ গুহ বলেন,— "নিম্নবর্গের চিন্তায়ও অলীক রাষ্ট্রবাদ দোটানায় এবং পরস্পরবিরোধী অর্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। একদিকে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বাস্তবে ও চৈতন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও তজ্জনিত দুর্বলতা। একদিকে তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা, সিদো-কানহুর হাতে-গড়া সাওঁতাল ফৌজ, ভারতের নানা স্থানে সারা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে হঠাৎ এক একটি জঙ্গি সমাবেশকে উপলক্ষ করে কয়েকদিনের জন্য বিদ্রোহীদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা— একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার এই নির্ভীক আত্মঘোষণা ও অপরদিকে ব্যর্থতা, পরাজয়, পলায়ন, হতাশা।"[৩০] আমরা তো আলোচ্য গল্পের নায়ক হোরোর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও তাকে সফল করার উপাদানের অভাবের ছবিই দেখেছি। ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স বা প্রতিবেদনে সে অন্যান্য বিরসাইট্দের মতোই 'সন্দেহভাজন জীব'। অলীক রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর হোরোরা দু-বছর আগে স্বরাজ ঘোষণা করে। পাদরিকে মারে, পুলিশকে মারে, অনেক পুল ভাঙে। আর তার পরের কাহিনিতে তাদের অনিবার্য পরিণতি— ওরমান্‌ঝির জঙ্গলে একটা খণ্ডযুদ্ধে তারা পরাজিত ও বন্দি হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাকে সেই ঘোষের কাছেই হাজিরা দিতে যেতে হয়, যে ছিল একসময় তারই সহপাঠী তথা প্রভুত্বকামী শক্তির এক ভিন্ন রূপ। ঘোষ যখন তাকে চিরকি মুরমুর কথা জিজ্ঞাসা করে তখন হোরোর চোখের ভাষায় জেগে ওঠে এক করুণ হতাশা। কারণ ফাদার লিন্ডন তাঁর নিম্নবর্গ নির্মাণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন আর চিরকি তাঁর নতুন শিকার— 'ফাদার লিন্ডনের মিশনে চলে গেছে চিরকি। খ্রিষ্টান হয়েছে। এখন হাজারিবাগে কনভেন্টে থাকে।'[৩১] ক্ষমতা দখলে অর্থাৎ জঙ্গলের অধিকার লাভের প্রয়াসে বুড়ো সোখা, বিরসা ভগবানের পাশাপাশি চিরকিও তো হোরোর প্রেরণার উৎস ছিল। কিন্তু বুড়ো সোখা জেলে গেছে, বিরসাও তো তার না-দেখা ভগবান, চিরকিকেও সে পেল না। শেষপর্যন্ত ব্যর্থতাই তাকে গ্রাস করল। কিন্তু এই ব্যর্থতার কথা হোরো কোথাও লিখে রাখে না। তার চোখে বা দৈহিক ক্রিয়ায় প্রতিবাদের ভাষা থাকলেও কথায় তাকে প্রকাশ করাটা পাঠক হিসাবে আমরা কোথাও দেখিনি। সে শিক্ষিত হলেও, লেখার কথা তো দূর, কখনও কোনো চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনেও তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। শুধু ঘোষ তার বক্তব্যকে বুঝতে পারে নানা আচরণ থেকে। সুতরাং তার নিজের ভাষায় যখন কখনও কোনো বক্তব্য শোনা যায় না তখন সহজেই প্রমাণ হয়ে যায় নিম্নবর্গের কোনো বক্তব্য নেই।

Scanned with OKEN Scanner

তবে নিম্নবর্গের এই অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদর্শনের ছবি লিপিবদ্ধ করতে তো কোনো বাধা নেই। তাকে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চরিত্রের জটিলতাকে অস্বীকার করা চলে না -- নিম্নবর্গ যা বলতে চায় তাকে উপেক্ষা করাও চলে না। আধুনিক সমালোচকেরা নিম্নবর্গ নির্মাণে এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন।[১৯]

আমরা দেখি, সুবোধ ঘোষ তাঁর গবেষণামূলক লেখা 'ভারতীয় আদিবাসী'তে এবং 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে সেই নিম্নবর্গের বয়ানই গড়ে তোলেন। হোরোর একগুঁয়ে মনোভাব, ফাদার ও ইন্টারক্লাসের বন্ধুবর্গের প্রতি তার রুক্ষ আচরণ, দোলনায় অসময়ে দোল খাওয়া ইত্যাদির উল্লেখ ও ব্যাখ্যায় যে-কথাগুলো হোরোর পক্ষে বলা বা লিখে রাখা সম্ভব হয়নি তাকেই তিনি ঘোষ দারোগার বয়ানে উত্তরকালের নিম্নবর্গ নির্মাণের জন্য লিখে রাখেন। হোরোর আচরণের সমস্ত জটিলতা পর্যবেক্ষণ করার পর ঘোষ উত্তরকালের পাঠকের জন্য তাকে আলোর বৃত্তে নিয়ে আসেন। ক্ষমতাবানের বিশ্বই বিদ্রোহীদের জবানবন্দি, পরোয়ানা বা রিপোর্টে ক্ষমতাহীনের রাষ্ট্রচিন্তাকে লিপিবদ্ধ করে রাখে। গল্পের ঘোষ ওরফে সুবোধ ঘোষও রেখেছেন। অতএব তিনিও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের একজন হিসাবে নিম্নবর্গ নির্মাণের অংশীদার।

এভাবে যদি আমরা দেখি তবে এ-যাবৎ গল্পটি নিয়ে যে-আলোচনার ধারা এগিয়েছে তার বাইরে তাকে নতুন করে দেখা সম্ভব হয়। আমাদের এই পুনঃপাঠে হোরো এবং সভ্যসমাজের সম্পর্কটি নতুন করে নির্ণীত হয়। আমরা লক্ষ্য করি, আধুনিক চিন্তাবিশ্বের শরিক না-হয়েও লেখক সুবোধ ঘোষ কীভাবে নিম্নবর্গ নির্মাণকে সার্থক করে তোলেন। 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' হয়ে ওঠে যথার্থ নিম্নবর্গ আখ্যান।

উল্লেখসূত্র ঃ

১। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : *সুবোধ ঘোষ* (প্রবন্ধ), 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী', ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯০।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রাশিয়ার চিঠি* ১, *রবীন্দ্ররচনাবলী* ১০, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৫৫৫।

৩। কল্যাণ মণ্ডল : *সুবোধ ঘোষের জীবন পরিচয়* (প্রবন্ধ), কোরক সাহিত্য পত্রিকা প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ১৪১৫, পৃ. ৩৯৯।

৪। দিব্যজ্যোতি মজুমদার : *ভারতের আদিবাসী ঃ কথাকার সুবোধ ঘোষের একটি গবেষণালব্ধ গ্রন্থ* (প্রবন্ধ), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ, ১৪১৫, পৃ. ৩৮৯।

৫। দেবব্রত চক্রবর্তী : *ভারতের আদিবাসী ঃ একটি সচেতন সমীক্ষা*, উত্তম পুরকাইত (সম্পা.) 'সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী', কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৩১।

৬। ওই।

৭। ওই।

৮। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ ভবন, ১৪১২, পৃ. ২১৯।

৯। ওই ৪।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রাশিয়ার চিঠি* ১, *রবীন্দ্ররচনাবলী* ১০, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৫৫৫।

১১। জগদীশ ভট্টাচার্য : *সুবোধ ঘোষ* (প্রবন্ধ), 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী', ভারবি, ১৯৯৪ , পৃ. ১৯১।

১২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: *জগদীশ গুপ্ত মানিক সুবোধ ঘোষ* (অধ্যায়), 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ. ৩৭১।

১৩। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প ঃ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য* (প্রবন্ধ), 'গল্প পাঠকের ডায়ারি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, পৃ. ১৫৩।

১৪। সুমিতা চক্রবর্তী : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প* (অধ্যায়), 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃ. ২৪৮।

১৫। তপন মণ্ডল : *গল্পের শ্রেণি বিভাজন* (তৃতীয় অধ্যায়),'গল্পকার সুবোধ ঘোষ - জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প', জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৭৫-৭৬।

১৬। প্রসূন ঘোষ : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প ঃ মাইক্রো ন্যারেটিভের নির্মাণ* (প্রবন্ধ), উত্তম পুরকাইত (সম্পা.) 'সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী', উজাগর, ২০১১, পৃ. ৬১।

১৭। দেবলীনা মুখোপাধ্যায় : *ব্যর্থ পানিপথের বিরহী নায়ক* (প্রবন্ধ), ওই, ২০১১, পৃ. ১৪৫।

১৮। কাননবিহারী গোস্বামী : *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প* (প্রবন্ধ), তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) 'বাংলা ছোটগল্প ঃ পর্ব-পর্বান্তর', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, ২০০৫, পৃ. ১৩৯।

১৯। গৌতম ভদ্র (সম্পা.) : পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা ঃ *নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস* (প্রবন্ধ), আনন্দ

Scanned with OKEN Scanner

পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৭।

২০। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ ভবন, ১৪১২, পৃ. ২১১।

২১। ওই, পৃ. ২০১।

২২। ওই।

২৩। Can the Subalturn Speak? in Cary Nelson and Lawrence Grossberg, eds. *Marxism and the Interpretation of Culture* (Chicago: University of Illinois Press 1988). *http://googlebooks.com/books?id=rtpgMCVSoplC&print sec.*

২৪। গৌতম ভদ্র (সম্পা.) : পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা : *নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৭।

২৫। পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকা : *নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস* (প্রবন্ধ), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৭-১৮।

২৬। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : *'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প'*, প্রকাশ ভবন, ১৪১২, পৃ. ২০১-২১১।

২৭। রণজিৎ গুহ : *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (প্রবন্ধ), গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৫।

২৮। ওই, পৃ. ৪৪।

২৯। মহাশ্বেতা দেবী : অরণ্যের অধিকার এবং..., 'অরণ্যের অধিকার' (উপন্যাস), করুণা প্রকাশনী, একবিংশ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ১৫। এখানে লেখিকা বলেছেন যে, জীবৎকালেই বিরসা ভগবানের মর্যাদা পায় ও মুন্ডারা তড়িৎগতিতে বিরসাকে 'ধরতি-আবা' বলে গ্রহণ করে।

৩০। ওই, পৃ. ৪৬।

৩১। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : *সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রকাশ ভবন, ১৪১২, পৃ. ২১১।

৩২। রণজিৎ গুহ : *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৬।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও সাময়িক পত্র

১। চক্রবর্তী, সুমিতা : *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

২। দেবী, মহাশ্বেতা : *অরণ্যের অধিকার*, করুণা প্রকাশনী, ১৪১৬।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *রবীন্দ্ররচনাবলী*, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, ১৯৯৫।

৪। পাল, রবিন : *বাংলা ছোটগল্প- কৃতী ও রীতি*, ব্রহ্মপুর প্রকাশন, ২০০৩।

৫। পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.) : *সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী*, ২০১১।

৬। ভদ্র, গৌতম (সম্পা.) : *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।

৭। ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.) : *সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রকাশ ভবন, ২০০৮।

৮। ভট্টাচার্য, তপোধীর : *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, অমৃতলোক, ২০০২।

৯। ভৌমিক, তাপস (সম্পা.): *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ২০০৮।

১০। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : *গল্প পাঠকের ডায়ারি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫।

১১। মণ্ডল, তপন : *গল্পকার সুবোধ ঘোষ - জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প*, জ্ঞানবিচিত্রা, ২০০৭।

১২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

১৩। মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পা.) : *বাংলা ছোটগল্প - পর্ব-পর্বান্তর*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, ২০০৫।

১৪। সেনমজুমদার, জহর : *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপণি, ২০০৭।

১৫। Guha, Ranjit (ed.) : *Subaltern Studies VI*, Oxford University Press, 1999.

❖❖❖

Scanned with OKEN Scanner